{শিরোনাম}

ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের ইতিহাস ও তাদের জনজীবন: ১৯৪৭ থেকে ২০১৫

দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে কখনো যেমন মৈত্রীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়, আবার দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয়ে মতানৈক্যের লক্ষ্য করা যায়। দুই দেশের মধ্যে এই আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য উদাহরণ লক্ষ্য করা গেছে। একটি যদি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করার সময়, অপরটি বিবাদ হিসাবে সীমানা নির্ধারণগত সমস্যা (Dispute)কে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য বর্তমান গবেষণা প্রসঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের সীমানার সংস্পর্শে 'ছিটমহল' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ছিটমহল বলতে এক কথায় বোঝায় 'কোন একটি নিদিষ্ট রাষ্ট্রের ভূভাগ যখন বিচ্ছিন্ন ভাবে অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থেকে যায়, তাকে ছিটমহল বলে'। এই ছিটমহলের ইতিহাস আলোকপাত করলে দেখা যাবে এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা কুচবিহারের এক ওতপ্রত সংযোগ আছে। মূলত, এর সূচনা মধ্যযুগে কুচবিহার রাজ্যের সাথে মুঘলদের দ্বন্দ্ব ও কখনো রাজ্যের অভ্যন্তরীন বিবাদ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ। এর বাইরে ছিল রাজার পাশাখেলাকে কেন্দ্র করে একাধিক কিংবদন্তী মূলক গল্প কাহিনী। এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগগুলি ক্ষমতাশীন দুই রাজ্যের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ।

এই দখলাকৃত অঞ্চলগুলি স্বাধীন পরবর্তী বিপরীমুখী ভূভাগে অবস্থান করতো বলে একে রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা প্রকট হতে দেখা যায়। সেখানে দেখা যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ভূখন্ডের বিচ্ছিন্ন ভূভাগ, আবার উল্টোদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ভূভাগ। এই উভয় অঞ্চলে থাকা অধিবাসীরা একে অপরের রাজ্যের ওপরেই নির্ভর ছিলেন এবং তারা সেই শাসকদের ওপরেও আনুগত্য দেখাতেন। এক্ষেত্রে বলা যায় কুচবিহারের রাজ্যের অধীনে যে

ভূভাগ ছিল তাকে ‘রাজওয়ারা’ বলা হতো, আর মুঘলদের অধিকৃত যে ভূভাগ ছিল তাকে ‘মোগলান’ বলা হত। আজও এদের কেউ কেউ এই শব্দ ব্যবহার করে। যা ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা উঠে এসেছে।

ব্রিটিশ সরকার শাসনাধীন সময়ে কুচবিহার ছিল ব্রিটিশদের করদ মিত্র রাজ্য। তাই সেভাবে ছিটমহল নিয়ে আলাদা করে বিবাদ কখনোই চোখে পরেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে সীমানা নির্ধারণে ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতার ফল স্বরূপ ছিটমহল সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। দেশ স্বাধীন হলে ছিটগুলি মূল ভূভাগের বাইরে থাকায় নাগরিক সুবিধা থেকে ছিল বঞ্চিত। যেখানে তাদের না ছিল ভোট দানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার কিংবা কর্মসংস্থানের অধিকার। এই না পাওয়ার যন্ত্রনা যেমন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে শিখিয়ে ছিল। তেমনী, ১৯৯০ এর দশক থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির উত্থান হতে দেখা যায়।

ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র ছিটমহল সমস্যা নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করে ১৯৫৮ সালে ‘নেহেরু-নুন চুক্তির’ মাধ্যমে। কিন্তু এতে ছিটমহল সমস্যার তেমন কোন উন্নতি চোখে পরে নি। বরং এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগের অধিবাসীরা নাগরিকত্বহীন একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর ১৯৭৪ সালে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ‘ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি’ দ্বারা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। আবার ১৯৯২ সালে ‘তিনবিঘা চুক্তি’র মধ্যদিয়ে আঙ্গারপোতা-দহগ্রামের ছিটমহলের সংযোগ করা হয়। যা আংশিক ভাবে ছিটমহম সমস্যা কিছুটা সমাধান করলেও ভারতীয় ভূভাগে এই চুক্তির ওপর বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল। ২০১০ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সময় উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা সফল হয়নি। ২০১৪ সালে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসলে আবারও ছিটমহল সমস্যা সমাধান নিয়ে দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৫সালে ৩১ সে জুলাই ‘ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমান্ত চুক্তি’ দ্বারা ছিটমহল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়।

সীমান্ত চুক্তির দ্বারা (২০১৫) ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হলেও, বিনিময় হওয়া ছিটমহলবাসীদের একাধিক বিষয় থেকে যায় অমীমাংসিত। বিনিময়ের প্রাথমিক পর্যায়ে উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলের অধিবাসীদের রাষ্ট্রে নির্বাচণের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয় ছিটমহলের ৯৮৭ জন অধিবাসী মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রস্তাব স্বীকার করেন। কিন্তু বাংলাদেশের ছিটমহল থেকে কেউ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি। যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে এলেন তাদের বসবাসের জন্য তিনটি অস্থায়ী পুনর্বাসন শিবির (দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী) নির্মাণ করা হয়। তবে অস্থায়ী শিবিরের প্রতিকূল পরিবেশে একাধিক অভিযোগ উঠে আসতে দেখা যায়। সেই অস্থায়ী শিবিরে থাকা বাস্তুচ্যুত ‘নব্য নাগরিক’ ও ছিট বিনিময়ে ‘সাবেকি ছিটের’ অধিবাসীদের দৈনন্দিন জনজীবনের ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে।